ভাঙা আমি ঘরে আধা বাইরে আধ

সেমন্তী ঘোষ

১

যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন সেই মাস্টারমশাই। 'তুমি ফিরে এলে? এখানেই থাকবে?' এবং তার পরেই অবধারিত প্রশ্নবাণ 'কেন বলো তো?' এবং এ প্রশ্নের সামনে আমার অবধারিত মূঢ়তা।

বছর দশেক আগে যখন আমি এম এ পরীক্ষা দিয়ে রওনা হয়েছিলাম বিদেশে 'উচ্চতর' শিক্ষার জন্যে, এই মাস্টারমশাই-ই তখন অসংশয়ী প্রত্যয়-প্রফুল্লতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন --- 'এই যে চললে, আর ফিরছ না। সুতরাং, বিদায়।' আমার চোখে উড়িয়ে দেওয়া ভাব দেখে আরও যোগ করলেন, 'যারা যায়, তারা কেউ ফেরে না। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক যাকে বলে। আর পড়াশোনার লাইনে থাকলে তো কথাই নেই! না, না, ফিরবে না কি আর? ফিরবে ... অতিথির মতো, বছরে বছরে।' বলে আবার সেই কিছুটা আত্মকণা, কিছুটা প্রত্যয়প্রফুল্লতা মেশানো হাসি।

সত্যি বলতে কি, ভেতরে ভেতরে বেশ অসহিষ্ণু লেগেছিল। এমনিতেই স্বভাবগত গণ্ডগোল, নিজের সম্পর্কে অন্য কেউ নিঃসংশয় মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করলে প্রবল রাগ হয়, 'এতটাই প্রেডিক্টেবল নই মোটেই ' গোছের একটা চ্যালেঞ্জ দেবার ইচ্ছে মনোমধ্যে নিশপিশ করে। তার ওপর আবার এমন একটা বিষয়? পড়াশোনো করতেই তো যাচ্ছি, থাকতে তো নয়! আর, পড়াশোনার লাইনের কথাই যদি ধরি, আমার বিষয়ের কথাই যদি ভাবি, কেউ-ই কি ফেরে না? ফেরেনি বিনয়বাবু? রজতবাবু? দ্রাংশুদা?

বিদ্রোহ সর্বদাই স্বভাবলক্ষণ। যত কম জ্ঞান, তত নিশ্চিত বিদ্রোহিতায় বিশ্বাস। বব ডিলানের একটা গানে আছে, ছোটবেলায় আমি জ্ঞানী ছিলাম, 'সব' জানতাম, এখন বয়স হয়েছে, তাই 'কিছুই' ঠিক জানি না! বিদ্রোহের ব্যাপারটাও ওই গোছের। সুতরাং কালের অমোঘ গতিতে বয়স বাড়ল, বিদেশ-বাসের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বাড়ল, আর বুঝে গেলাম উল্লিখিত মাস্টারমশাই-এর প্রত্যয়প্রফুল্লতার অর্থ। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটাও বুঝে গেলাম যে কেন পড়াশোনা ভালোবাসলেই দেশে ফেরা আরও বেশি কঠিন। বিনয়বাবু এমনকি দ্রাংশুদাদের কালও সে কবেই কেটে গেছে। সত্যিই কিছু একটা 'করে' ফেলতে চাইলে --- না ফেরাটাই যুক্তিসঙ্গত এখন, এই শেষ নববই-এর সময়ে। কেন-র মধ্যে ঢুকছি না। সে বৃত্তান্তে সবাই জানেন, রোজ কাগজে দু'কলম করে নানা ভাষায় সে সব অবক্ষয়ের কথা লেখা থাকে। আর, কিছুই না 'করে', যেমন তেমন ভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়াটাই যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে ---- কেনই বা দেশে ফেরা? কত টাকা, কত স্বাধীনতা দুনিয়াটাই ওখানে হাতের মুঠোয়। আর অতিথির মতো বছরে বছরে দেশে বেড়াতে এলে তো রাজা। কলকাতার সব মজা দু'মাসে দু'হাতে কিনে আবার পাড়ি।

কেউ কেউ থাকে যারা এ দু-এর মধ্যিখানটায়। না আছে কিছু 'করার', আবার 'না করা'টাও পছন্দ না। সেই আদ্যন্ত কনফিউজড জীবরা ভেসে বেড়ায় এখানে ওখানে। মনস্থির করতে পারে না। আমার হল সেই দশা। ফিরেই এলাম। কিন্তু ফিরলামও না।

না, কাব্যির কথা না। সত্যি করেই ঝুলতে শু করলাম ঠিক মাঝখানটাতে। আদ্ধেক সময় দেশে থাকি, বাকি আদ্ধেক বিদেশে। একটা নারীবাদী টুইস্ট দিয়ে বলা যায়, দেশে থাকি হাফ, বিদেশে বেটার হাফ (স্ত্রীই যে সব সময় বেটার হবেন, এমন লোক দেখানো ভদ্রতার দরকার কী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বামীই না হয় বেটার হোন)। স্বামী বিদেশে পড়ায়, এবং তুলনামূলক হিসেবপত্তর কষে, না ফেরাটাই তার পছন্দ, তাই আমারও অর্ধেক পছন্দের ভাগ গেল ওদিকে --- হাজার হে াক, অর্ধাঙ্গিণী বলে কথা! অবশ্য, নারীবাদী উত্তেজনার খাতিরেও মিথ্যাচরণ উচিত নয়, তাই বলে দেওয়া দরকার, কেবল আমিই বুঝলাম না, অর্ধাঙ্গিণীর ঝুলোঝুলিতে ঝুলতে শু করল স্বামীমশাইও। ঘোর দুর্বিপাকে পড়ে তেতো বড়ি খাওয়ার মতো তাকেও পার্টটাইম জাতীয়তাবাদী বনতে হল। পড়াশোনার 'লাইন টা' যেহেতু বিদেশে আশর্চ্য রকম 'ফেক্‌সিবল' ত াই অধ্যাপনা বা গবেষণা, কোনোটাই স্বামীর ঝোঝুল্যমানতার প্রতিবন্ধক হল না। আর ও পারে যেহেতু ব্যাপার স্যাপার অন্যরকম, ঝুলবার সুবিধার জন্য আমি পড়াশোনার 'লাইন অনেক ভেবে চিন্তে ছেড়েই দিলাম। তারপর -- তারপর আর কী, আনন্দ উদ্ভাসন। স্রোতে ভাসা, যাওয়া আসা।

২

ঠিক এই জায়গাটাতে এসে পাঠকের মনের কোণে বিরক্তি-মিশ্রিত উত্তেজনা জমে উঠতে শু করবে 'আচ্ছা, বিদেশের পড়াশোনার জগৎটাই কেবল ভালো আর ''ফ্লেক্‌সিবল'' ! হুঁ যত্ত সব! এখানে আমরা কি সব ভ্যারেন্ডা ভাজছি?' সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে এম এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হতে যখন বিদেশের দ্বিতীয় এম এ-র (পিএইচ ডি-র আগে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মার্কিনমুলুকে গিয়ে যেটা করতেই হয়) জন্য দরখাস্ত করি, তখন আমারও এরকম বিরক্তি হয়েছিল মনে পড়ে। তবে, আমার সেই একই কথা --- গেলাম, বয়স বাড়ল এবং দ্বিতীয় এম এ-টা করতে করতে উপলব্ধি করলাম, প্রথমটায় যা শিখেছিলাম, তা দিয়ে পরীক্ষা পাস করা যেত, কিন্তু গবেষণা করা যেত না। গবেষণার জন্য যতটুকু জ্ঞান নেহাতই দরকার এম এ-তে তাই অর্জন করলাম, প্রথমটা হয়ে রইল কেবলই সুমধুর মুখবন্ধ। ফলে এখানকার ঝিবিদ্য ালয়ে ভ্যারেন্ডা না ভাজলেও ঠিক সুস্বাদু কোনো রন্ধনবিদ্যে যে আয়ত্ত করতে পারিনি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পাঠক তর্ক জুড়তে চাইবেন, সে আমার মাথায় দোষ। বাকিরা কি এখানেই শিক্ষা পেয়ে এখানেই গবেষণা করছে না? জব াবে তর্ক করব, আমার মাথার দোষ প্রথমেই প্রকাশ্যে স্বীকার্য। কিন্তু সেই নিরেট মাথায় কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ের চেয়ে বিদেশি ঝিবিদ্যালয়টি যে বেশি কাজের জিনিস ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই! ওখানে পড়াশোন া করতে গিয়েই তো প্রথম জানলাম, ক্লাসে, বিশেষত এম এ ক্লাসে ---- মাস্টারমশাই পড়ান না, নোট দেন না। বরং অ াগে থেকেই ক্লাসে পঠিতব্য বিষয়ের লিস্ট দিয়ে দেওয়া হয়, আর ছাত্রছাত্রীদের সেটা দেখে দেখে নিজেরাই পড়ে শুনে তবে আলোচ্য দিনের ক্লাসে ঢুকতে হয়। শিক্ষক বা শিক্ষিকা খালি হাতে ক্লাসে ঢুকে আড্ডার সুরে বলেন --- বলো, তে ামরা কে কী পড়লে, কে কী বুঝলে। অর্থাৎ ঠিক ঠিক উল্টপুরাণ, তাকে বলার ভার আমাদের। তিনিও বলবেন নিশ্চয়ই। তবে সে বলাবলির মধ্যে 'আমি যা বলছি, সেটা লিখে নাও' ভাবটা দুরস্থান, 'আমি যা বলছি, সেটাই ঠিক', সে ভাবটুকুও থাকে না। বাস্তবিক, তিনি যা বলবেন, সেটা খণ্ডন করলেই তিনি খুশি হন বেশি। আর কেউ যদি কিছুই না বলে স্রেফ 'লক্ষ্মী' ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকতে চায় কপালে অনেক দুঃখ।

পাঠক এবার তেড়েফুঁড়ে উঠছেন। আমাদের দেশের মাস্টারমশাইরা কি কেবল নোট দেন, আলোচনা করেন না? পষ্ট াপষ্টি উত্তর দেব, না। করেন না। কারণ আলোচনা করতে হলে যে পরিমাণ সময় তাঁকে দিতে হবে, নিজেকে এবং ছাত্রছ াত্রীদের জন্য, তাতে তাঁদের খরচে পোষায় না। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিত্রম হিসেবে যাঁরা আছেন, তাঁরা সত্যিই আলে াচনায় উৎসাহ দেন, কিন্তু এটাকেই পড়ানোর পথ হিসাবে না নিয়ে বরং একটা ক্লাসের 'পুনশ্চ' হিসেবে ব্যবহার করেন। এবং কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বেশি প্রশ্ন করলে সেটাকে রীতিমত বিরক্তিকর স্পর্ধা হিসেবে গণ্য করেন। প্রশ্ন করাটা এখানে মে াটেও সুবোধত্বের লক্ষণ নয়।

দেশের ঝিবিদ্যালয়ের সপক্ষে যাঁরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে চান, তাঁরা তুলবেন ছাত্রছাত্রীর বিরাট সংখ্যার কথা। এত বড় ক্লাসে কি এই পদ্ধতিতে পড়ানো সম্ভব? আমি উল্টে বলব, কেনই বা এখানে ক্লাসকে সব সময়ে এত বড়োই বতে হয়, যাতে পড়া এবং পড়ানোয় কমপ্রোমাইজ করা ছাড়া উপায় থাকে না? এটা শুনেই আগের পক্ষ রে রে করে উঠবেন, ওই তো, বোঝা গেছে, শিক্ষার এলিটীকরণের কথা যে পাষণ্ডরা বলে, ইনিও তাঁদের দলে! একদম ঠিক। তবে এই মুহুর্তে ও তর্কটা শিকেয় থাক।

৩

শিকেয় থাকলেও হঠাৎ এ প্রসঙ্গটা তোলার একটা অন্য কারণ আছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, বিদেশ আর দেশের পড়াশোনার ধাঁচটার এই পার্থক্যটার এক আলাদা তাৎপর্য আছে। আসলে এই দুটো ধাঁচ দুটো সভ্যতার , দুটো প ার্থক্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। কোনটাকে বলে না; কে 'ভালো' ছাত্র, আর কে নয়--- দুই পৃথিবীর মূল্যবোধের সাধারণ ধরনটাই পৃথক। দুই জায়গায় মাস্টারমশাইরা দুই ছকে পড়ান, ব্যাপারটা শুধু এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার চেয়ে আরও গভীর কিছু। এই 'কিছু'টা হল--- মূল্যবোধ, জীবনদর্শন। দৈনন্দিন জীবনে বিদেশের কোন জিনিসটা ভালো আর কোনটা তত ভালো নয় এ কথা আজকাল মোটামুটি সবাই জানেন। প্রায় প্রতি পরিবারেরই কেউ না কেউ বিদেশে থাকেন বলে, সকলেরই অল্পবিস্তর জানা হয়ে গেছে সেগুলো। জানা হয়ে গেছে, দেশের ভালো --খাবাপ গুলোও। চাকরি নেই, চাকরিতে 'কাজের সন্তুষ্টি' নেই, আইনশৃঙ্খলার দুরবস্থা, ট্র্যাফিক, দুর্নীতি,, অবক্ষয়, পরিবেশ দূষণ বনাম বাড়িঘর, বাচচাদের ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, মানুষের উষ্ণ ব্যবহার, সামাজিকতা ইত্যাদি আর কী! এই সাধারণ চারিত্র্যলক্ষণগুলোর মধ্যে না ঢুকে আমি বলতে চাইছি একটা মূল্যবোধের পার্থক্যের কথা, দর্শনগত দূরত্বের কথা। এই দূরত্বটা আমার কাছে আপ াতত খুবই গুত্বপূর্ণ, কেননা আমার বর্তমান জীবনযাপন সেটা এক আশর্চ্য বিভাজিকা এনে দিয়েছে। এখন আসলে আমি বোধ হয় একই সঙ্গে দুটো জীবনে বাঁচছি যে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিই শেষ সত্য --- স্থান ও কাল পাল্টানোর সঙ্গে বস্তু অর্থাৎ নিজেকেও আমি প্রয়োজনমত পাল্টে নিই। সেই পাল্টানোর কথাটাই বলতে চাই এখানে, এবং তার জন্যই --- - পাল্টানোর অন্যতম মূল সূত্র হিসেবে দিতে হল ওপরের এই উদাহরণ।

আসলে কেবল পড়াশোনায় লাইনেই নয়, বিদেশে বাঁচার প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে প্রমাণ করার একটা বিশেষ দায় থাকে। কখনো ক্লাসের মধ্যে প্রা করে, কখনো অন্যভাবে। কখনো এমনকি তার মধ্যে থাকতে পারে একাকিত্বের দুঃসহ ভার বহন করার শক্তি কতটা, সেই প্রমাণ দেওয়াটাও। আমি যে একা সত্যটা বিদেশে যেমন করে বুঝতে পারি, দেশে তেমন করে পা রিনি, পারি না। ----ক্লাসের মধ্যে প্রা করে সত্যি সত্যি একটা পঠিতব্য এবং বিষয় এবং নিজের সম্পর্কটা বুঝে নেওয়ার অভিজ্ঞতার মতোই, গোটা পৃথিবী এবং এই ব্যক্তি আমির সম্পর্ককে প্রতি পদে প্রা করে, তর্ক করে হাল ছেড়ে দিয়ে, নতুন উদ্যম এনে, আবার নতুন দফার অন্তর্দর্শনের মধ্যে ঢুকে, যে করেই হোক নিজেকে নিজের এবং অন্যদের চোখে প্রতিষ্ঠা কর ার এই অভিজ্ঞতাটাও একটা আবিষ্কার। বিদেশে পা দেওয়ার আগে নিজেকে যেন অন্যরকম করে চিনতাম, তাই এ নিজেরই পুনরাবিষ্কার। আবার, নিজের এই পুনরাবিষ্কারের কারণেই বাইরের পৃথিবীটাকেও সে চোখে দেখতে শু করি, সেটারও পুনরাবিষ্কার ঘটতে থাকে সামনে।

কী কী থাকে এই আবিষ্কারটার মধ্যে? থাকে তীক্ষ্ম আনন্দ। তীব্র একটা প্রাপ্তির বোধ। নিজের সম্পূণটা দেখতে পাওয়া একটা নির্মল সন্তুষ্টি। এবং তারই হাত ধরে ধরে---অতল ভয়। নিরন্তর আত্মসংশয়। যে আমিটার শুধু ভালোগুলোই না, অপ্রত্যাশিত দুর্বলতাগুলোও নিজের চোখে ধরা পড়ে গেছে, তাকে নিয়ে প্রতি পদের অনিশ্চিতি। প্রাপ্তি কিম্বা সংশয়, ভয় বা আনন্দ, সবকয়টি অনুভূতি মিলেমিশে থাকে পরস্পরের সঙ্গে। আর সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তাতে পুরো অনুভূতির জগৎটাই যেন ভারি একটা তীক্ষ্ম সুরে বাঁধা হয়ে থাকে। অল্পেই আসে ধিক্কার, অল্পেই খুশির হাওয়া।

এই তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে দিন কাটানোর ভালো দিকও আছে। আছে খারাপও। পড়াশোনা বা কাজের ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা কতটা, কোন জায়গায় কতটা জোর বা কতটা ফাঁকি, সেটা চোখের সামনে প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে ওঠে বলেই সেখানে ক্ষমতার যথাসাধ্য মর্যাদা দেওয়াটাও বেশি সহজ হয়। কাজ করার সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা বেড়ে যায়। কেবল আত্মদর্শনের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য নয়, কাজের সময়, ক্ষমতা আর ইচ্ছা বেড়ে যায় একক জীবনযাপনের ধরনটার জন্যও। যদি একাই বাঁচা, তাহলে যেটা পারি, কিংবা করলে পেরে যেতে পারি, তাতে মন দেওয়ার সময়ও আপনা থেকে বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বাঁচা তো শেষ পর্যন্ত নিজেরই বাঁচা?

আর খারাপটা? প্রবল একাকিত্ববোধ আর প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রমাণ করার তাড়নার খারাপ দিকটা বোঝা কঠিন নয়। একা বাঁচার---- বাইরে থেকে, এবং ভেতর থেকে --- ওই যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি, তার সামনে পড়ে ভেতরে ভেতরে ঘনিয়ে ওঠে অসহ্য অসহায়তা আর তৃষ্ণার কালচে অন্ধকার।

৪

দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এবার পার্থক্যের বিষয়টা বোঝা সহজ হতে পারে। দেশে আমরা 'প্রা' করার তাগিদটা যে অনুভব করি না, তার কারণ প্রা না করেই আমরা দিব্যি খোশমেজাজে ক্লাসম থেকে বার হয়ে আসতে পারি। নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলাম, এই খোঁচাটা আমাকে অত জ্বালায় না। প্রতিযোগিতার আবহ অত আদিগন্তব্যাপী নয় বলেই জ্বালা কম হয়। প্রমাণ না করতে পারলেও আমি তো আমিই, দিব্যি তো বাঁচছি---- এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। কেবল ক্লাসে নয়। বাড়িতে, বন্ধুবৃত্তে, কর্মক্ষেত্রে --- কোথাও নিজেকে একক প্রমাণ করার দায় নিরন্তর আমার পিছু ছুটে বেড়ায় না। কেননা জানি যে, নিজেকে নিয়ে না ভেবে একটা সমাষ্টির সঙ্গে জীবন কাটিয়ে যাওয়াই এখানে দস্তুর। এক যুথবদ্ধ পৃথিবীর নিজস্ব দস্তুর। এই যুথবদ্ধতার ভালোদিকও আছে, খারাপ দিকও।

খারাপ দিকটা বোধহয় এই যে, প্রাহীন আমার অস্তিত্ব, নিশ্চিন্ত থাকতে পারার এই অখণ্ড অবসর নিশিদিন বড়ো অলস করে রাখে। দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছে অজস্র নক্ষত্রের সার, মাঝখানে কতটুকু সময় এ জীবনে? সেই সময়টুকুর থেকে যেটুকু অর্থ নিঃসৃত হতেও পারত, তার প্রতি অমনোযোগ দেওয়াটা তো জীবনেরই অসম্মান? অর্সতকতাবশত একটা বড়ো অবিচার করে ফেলি যেন, নিজের প্রতি, এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের প্রতি।

অথচ আবার, বড় অর্থে জীবনের যে মানেটা হারিয়ে যায়, ছোটো ছোটো সেই মানেগুলোকে এখানে ওখানে, সকলের মধ্যে, সকলের সঙ্গে খুঁজে পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে। মানুষ তো কেবলই নিজে বাঁচার জন্য জন্মায় না। তাই অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ বাঁধবার ছোটো ছোটো সেতু, সহজ কিছু মানে তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

এর সব কটা কথাই যে দেশ বা বিদেশের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তার কোনো মানে নেই, অবশ্যই। সেরকম ভাবনা ছেলেমানুষি হবে। এটা কোনো অঙ্কের হিসেব বা অর্থনীতির মডেল নয়, একটা সামাজিক ধাঁচ কেবল। ক্যালেন্ডার দেখে বছরটাকে দু'ভাগে নিপুণ হিসেবে ভাগ করে নিতে নিতে আমি যেন এই দুই মূলগত ধাঁচের একটা আভাস পেয়ে যাই, খানিকটা অসচেতনেও।

৫

পাঠক এতক্ষণে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে অত্যন্ত দরকারি একটা প্রা তূলে ফেলেছেন। না হয় থাকলই দুই পৃথিবীর দুই আলাদা ধাঁচ। কিন্তু আসল কথাটা তো অন্য। দু'রকমের ধাঁচে নিজেকে এই যে সমানে গুছিয়ে নিতে হয়, এটা কি আদৌ ভালো? মাথা চুলকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই 'আসল' প্রশ্নের সামনে আমি নেহাত অসহায়, উত্তরটা জানি না বলে। এটুকু জানি যে নিজের মধ্যে এ জন্য একটা বিভাজিকা তৈরি করে নিতে হয়, আজকালকার পণ্ডিতদের ভাষায় যেটাকে বলা যেতে প

ারে ‘ ’। তাই কলকাতার ফ্ল্যাটে সকালের ঘুমভাঙা ঘোরে বাজারে যাওয়ার কথা ভাবলে হঠাৎ হঠাৎ ভুল করে ফুটে ওঠে একটা অন্য পাড়ার মানচিত্র, যেখানে লেক মিশিগানের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে হবে শিকাগো শহরের হাইড পার্ক কো-অপারেটিভ মার্কেটে। স্পষ্ট ভাসতে থাকে সে মার্কেটের পাঁউটি আর ডিমের অবস্থান, চট করে নেমে তুলে নিয়েই সাত তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে বসতে হবে। তাই দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে তৈরি হতে গিয়ে জানলায় বাইরে চোখ পড়ে যায়, একটা অন্য রাস্তা, অন্য পার্ক, পার্কের পাশে অন্য মুদির দোকানে অগোছালো করে রাখা পাঁউটি-ডিম-ফিফটি ফিফটি বিস্কুট-সার্ফ-ধারা সর্ষের তেল। ঘুমঘোর নিমেষে ছুটে যায়। বিভাজিকা আবার গোছালো চটপটে ভঙ্গিতে স্বস্থানে স্থিত হয়ে যায়। তৈরি হয়ে নিই বাজারের জন্য। গলাবন্ধ জ্যাকেট-টুপি-ট্রাউজার্সের বদলে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে।

এও জানি যে, প্রতিবার যখন নির্ধারিত ফ্লাইটের জন্য বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষায় থাকি, ভেতরে ভেতরে এক দুর্নিবার মানসিক প্রস্তুতি চলে, পরবর্তি গন্তব্যের ধাঁচটার মধ্যে নিজেকে প্রক্ষেপ করার প্রস্তুতি । কখনো সে প্রস্তুতি একটা কঠিন কিন্তু চ্যালেঞ্জিং জীবনের জন্য, কখনো একটা সহজ আর আরামদায়ক জীবনের জন্য। একটাতে একা-একা বাঁচা, নিজেকে খুঁজে পাওয়া, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চ্যালেঞ্জ। আর একটাতে, ছোট ছোট জীবনের ছোট ছোট ঘটনায় নিজেকে অনেকগুলো খণ্ডে ভাগ করে ছড়িয়ে দেওয়ার আরাম। বিভাজিকা নির্ভুল ভাবে কাজ করে যায়, ক্যালেণ্ডারের হিসেব দেখে ।

এই প্রক্ষেপন আর প্রতীক্ষণের কাজটাতে অনেকখানি জীবনীশক্তি নিশ্চয়ই খরচ হয়ে যায়, সময় বয়ে যায়, ক্লান্তি ছড়ায় সর্বশরীরে। যেভাবে বড় কড়া হাতে, দিন গুনে, ঘন্টা মেপে পরিচালনা করতে হয় নিজের বাহ্য এবং অন্তরকে, তার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা অস্বীকার করতে পারা যায় না। কিন্তু পদ্ধতির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি ফলাফলের দিকে তাকাই, তখন কিন্তু সে যান্ত্রিকতা আর পরিশ্রমের ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়ে যায়। বুঝতে পারি যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন আর উড়নচণ্ডি এই জীবনযাত্রার একটা গভীরপ্রসারী পুরস্কার আছে। আছে নিজেকে সমৃদ্ধ করার অন্তহীন সন্তোষ। বিদেশ ও দেশ, দুটোকেই ভেতর থেকে চিনে যাওয়ার সুযোগ। আছে বিদেশের চোখে দেশকে আর দেশের চোখে বিদেশকে প্রশ্ন করার স্পর্ধা। আর বুঝতে পারি, এক বার যে এ দুই পৃথিবীতে অনবরত নিজেকে উন্মোচিত করার সৌভাগ্য-অমৃত লাভ করেছে, তার পক্ষে আর কখনো নির্বিচারে এক পক্ষকে বেছে নেওয়ার পানসে স্বাদে খুসি হওয়া সম্ভব নয়।

নইপল তাঁর লেখায় একবার এক ইরানি মেয়ের কথা লিখেছিলেন, যে মেয়ে বহু দিন আমেরিকায় কাটিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে আর নয়, তাকে এবার নিজের দেশে ফিরতেই হবে; বুঝতে পেরেছিল, ’that she has trapped herself and that she will never return to the clarity and light of suburban Boston’। চমকেই গিয়েছিলাম কথাটা পড়ে। কেননা, একেবারে একই শব্দের ভিন্ন ব্যবহারে আমি মনে মনে ভেবে থেকেছি একদম বিপরীত এক উপলব্ধির কথা। ভেবে থেকেছি আমার, অর্থাৎ আমার সবচেয়ে পরিচিত মেয়েটির মনের কথা, যে মেয়ে নিজেকেই নিজের বিভাজিকার ফাঁদে ফেলেছে , যে ফাঁদের সদা-বিচ্ছুরিত ‘clarity’ আর light’-- এর মায়া আর সে কাটিয়ে উঠতে পারবে না কোনো দিনই।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com